

বৃক্ষরোপণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলবায়ু সহনশীল উন্নয়নের সমন্বিত রূপরেখা

ড. মোঃ সাইফুর রহমান

পরিবেশ, বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ আজ আর কেবল একটি খাতভিত্তিক কর্মসূচি নয়; এটি টেকসই উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা এবং জলবায়ু সহনশীলতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটি জাতীয় অগ্রাধিকার। জলবায়ু পরিবর্তনের দ্রুতগতির অভিঘাত, জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয়, নদী ও জলাশয় দূষণ এবং নগরায়ণের চাপের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে একটি সমন্বিত পরিবেশ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি অনুভূত হচ্ছে। এ বাস্তবতায় বর্তমান সরকারের পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন দর্শন বৃক্ষরোপণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, সবুজ অর্থনীতি এবং নাগরিক অংশগ্রহণকে একই সূত্রে গুঁথে একটি দীর্ঘমেয়াদি ও বিজ্ঞানভিত্তিক রূপরেখা উপস্থাপন করেছে, যা জলবায়ু-সহনশীল বাংলাদেশ ও বিনির্মাণের পথনির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৯ জুলাই ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে “বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২৬” উদ্বোধন উপলক্ষ্যে যে ভাষণ দিয়েছেন পরিবেশ সম্পর্কিত জ্ঞান, গবেষণা এবং নীতির অনুশীলনে একজন আগ্রহী কর্মী হিসেবে বলতে পারি—এটি কেবল পরিবেশ দিবস বা মেলা উপলক্ষ্যে একটি প্রথাগত আনুষ্ঠানিক বক্তব্য ছিল না বরং তিনি বাংলাদেশের পরিবেশ, বন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় একটি সমন্বিত নীতি-দর্শন উপস্থাপন করেছেন। সরকারের উপস্থাপিত নীতিগত দিকনির্দেশনায় বৃক্ষরোপণ ও সবুজায়ন থেকে শুরু করে প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন ও সহনশীলতা, টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ শিক্ষা ও সামাজিক আন্দোলন, সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা—পরিবেশ সুরক্ষার সকল গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ও একই সাথে ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন।

সরকারের নীতিগত অবস্থানে বন ও পরিবেশ সংরক্ষণকে শুধু পরিবেশ ও বন বিভাগ বা সরকারের দায়িত্ব হিসেবে নয়, বরং রাষ্ট্র, সমাজ, স্থানীয় জনগণ এবং প্রতিটি নাগরিকের সম্মিলিত দায়িত্ব হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি, পানি, জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতি—এসব একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ও আশাব্যঞ্জক বিষয় হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণ বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন যা নিছক একটি বক্তৃতা ছিল না—ছিল পরিবেশভিত্তিক সুদূর প্রসারী জ্ঞান ও তথ্যের সমাহার, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এবং বাস্তবমুখী সমস্যা সমাধানের দিক নির্দেশনা। দেশের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা পলিসি ডিরেক্টিভস হিসেবে বিভিন্ন পর্যায়ের নীতি নির্ধারক, গবেষক, পলিসি এনালিস্ট, উন্নয়ন কর্মী, প্রকৃতি ও পরিবেশবিদ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং সাধারণ জনগণ—সকলের জন্য অনুসরণীয়। উক্ত বিবৃতি দেশের পরিবেশগত বিরাজমান সমস্যা সমাধান ও নীতি বাস্তবায়নের ব্লু প্রিন্ট হিসেবে কাজ করতে পারে।

বর্তমান সরকার পাঁচ বছরে পঁচিশ কোটি বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এই কর্মসূচির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক বার্তা হলো—“যে কোনো গাছ নয়, সঠিক পরিবেশে সঠিক দেশীয় প্রজাতির গাছ”। সাম্প্রতিক বনায়ন ও বন পুনরুদ্ধারবিষয়ক গবেষণায় দেখা গেছে, একক প্রজাতির বনায়নের তুলনায় দেশীয় বহুবিধ প্রজাতির বন অধিক কার্বন ধারণ করতে পারে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে এবং দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় বেশি কার্যকর। এখানে “মাদার ট্রি” সংরক্ষণের ওপর তাঁর গুরুত্বারোপও তত্ত্বে ও প্রয়োগে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বন-বাস্তুসংস্থান গবেষণা বলছে, বৃহৎ ও পুরোনো গাছগুলো বন পুনর্জন্ম, বীজ বিস্তার এবং কার্বন সংরক্ষণে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। এজন্য বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে প্রয়োজন—জিআইএস-ভিত্তিক পরিকল্পনা, স্থানীয় বাস্তুসংস্থানের উপযোগী প্রজাতি নির্বাচন, বিদ্যমান গাছের যথাযথ পরিচর্যা নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় জনগণকে বন-ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করা।

“সরকারের পরিবেশ বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো—বনায়নই শেষ কথা নয়; সেই বন অনুষঞ্জী প্রাণী, পাখি, কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য জীবের জন্য উপযোগী কি না সেটিও বিবেচ্য। বর্তমানে বৈশ্বিক পরিবেশ নীতি ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কেবল গাছের সংখ্যা নয়; বরং বাস্তুতন্ত্রের কার্যকারিতা, প্রজাতিগত বৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণী আবাসস্থল এবং পরিবেশগত সংযোগকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন অবক্ষয়িত বন পুনরুদ্ধার, বন্যপ্রাণীর করিডর সংরক্ষণ, ম্যানগ্রোভ ও জলাভূমি পুনরুদ্ধার, পরাগায়নকারী কীটপতঙ্গ সংরক্ষণ, বিদেশি আগ্রাসী প্রজাতির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ।

বক্তৃতায় নদী দূষণ রোধ, খাল ও নদী খনন ও পুনঃখনন এবং নদীকেন্দ্রিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সরকার সারাদেশে বিশ হাজার কিলোমিটার নদী ও খাল খনন ও পুনঃখননের কার্যক্রম শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী যথার্থভাবেই উল্লেখ করেছেন, নদী রক্ষা করতে না পারলে কৃষি, খাদ্য ও পানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। গবেষণা বলছে, নদী ও

জলাভূমি শুধু পানির উৎস নয়; এগুলো বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ভূগর্ভস্থ পানির পুনর্ভরণ, মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু অভিযোজনের অন্যতম ভিত্তি। এজন্য বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন—সমন্বিত নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা, নদীর তীরভূমিতে সবুজ বাফার, শিল্পবর্জ্য নিয়ন্ত্রণ এবং নদী পুনরুদ্ধারে সচেতনতা ও স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ।

সরকার স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে যে, জলবায়ু পরিবর্তন আর ভবিষ্যতের বিষয় নয়, এটি ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের বাস্তবতা ও দেশ এর ভয়াবহ প্রভাব মোকাবিলা করছে। ঘূর্ণিঝড়, তাপপ্রবাহ, বন্যা, লবণাক্ততা ও নদীভাঙন কৃষি, স্বাস্থ্য ও অর্থনীতিকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এ প্রেক্ষাপটে ‘সবুজ, পরিচ্ছন্ন ও জলবায়ু-সহনশীল বাংলাদেশ’ গড়ার লক্ষ্য জলবায়ু নীতি ও সামাজিক ন্যায্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, খ্রি-আর (রিডিউস, রিইউজ ও রিসাইকেল) নীতির উন্নয়ন, জৈব সার উৎপাদন ও পুনঃব্যবহার এবং বর্জ্য থেকে জ্বালানি উৎপাদনের ওপর যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা একটি ‘সার্কুলার অর্থনীতি’-ভিত্তিক উন্নয়ন দর্শনের প্রতিফলন। গবেষণা দেখায়, শুধু বর্জ্য অপসারণ নয়, বরং বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর করলে পরিবেশ দূষণ কমে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং গ্রিন ইকোনমি শক্তিশালী হয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন—উৎসে বর্জ্য পৃথকীকরণ, চালু, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা ও প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার শিল্পে বিনিয়োগ।

সকল নাগরিকের দায়িত্বশীল আচরণ একটি টেকসই ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার মূলমন্ত্র। সরকারের নীতিগত অবস্থান অনুযায়ী শুধু আইন প্রয়োগ, শক্তি প্রয়োগ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন নাগরিক সমাজের আচরণের গুণগত পরিবর্তন। এ বিষয়ে পরিবেশবিদ এবং প্রতিশ্রুতিশীল তরুণদের এগিয়ে এসে নাগরিক সমাজকে সচেতন করা অপরিহার্য মর্মে গুরুত্বারোপ করা হয়। একইসঙ্গে, সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার যে অঙ্গীকার তা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নিঃসন্দেহে অতি গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারের উপস্থাপিত নীতি-দর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো—এটি পরিবেশকে বিচ্ছিন্ন কোনো খাত হিসেবে নয়, বরং জাতীয় উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং জলবায়ু সহনশীলতার ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। বৃক্ষরোপণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, নদী পুনরুদ্ধার, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু সহনশীলতা, সবুজ অর্থনীতি এবং নাগরিক অংশগ্রহণ—এই সাতটি স্তরের ওপর দাঁড়িয়ে একটি প্রকৃতি-সমন্বিত উন্নয়ন মডেল গড়ে তোলার আহ্বানই এই বক্তৃতার মূল বার্তা। উন্নয়ন ও পরিবেশকে প্রতিদ্বন্দ্বী না ভেবে বরং প্রকৃতির সাথে সম্প্রীতি বজায় রেখে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি গড়ে উঠুক এটি বর্তমান সরকারের প্রত্যাশা ও পরিকল্পনা মর্মে তিনি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন। এই নীতি-দিকনির্দেশনা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (কুনমিং-মন্ট্রিল গ্লোবাল বায়োডাইভার্সিটি ফ্রেমওয়ার্ক) ও জলবায়ু পরিবর্তন (প্যারিস জলবায়ু চুক্তি) এবং টেকসই উন্নয়ন (জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, এসডিজি)) সম্পর্কিত ফ্রেমওয়ার্ক ও প্রটোকলের সাথে গভীরভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।

এখন প্রয়োজন এই নীতিগত অঙ্গীকারকে বাস্তবায়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা, শক্তিশালী আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়, স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ সুশাসন নিশ্চিত করা। তাহলেই “সবুজ, পরিচ্ছন্ন ও জলবায়ু-সহনশীল বাংলাদেশ” কেবল একটি রাজনৈতিক অঙ্গীকার নয় বরং বাস্তব উন্নয়নের ভিত্তিতে পরিণত হতে পারে।

#

লেখকঃ যুগ্মসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার